ঘোষক ইতিহাস

'ঘোষক ইতিহাস' এর প্রথম এবং প্রধান সাক্ষী মেজবাহ উদ্দিন জওহের। ২৬মার্চ'৭১এ কীভাবে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে উচ্চারিত স্বাধীনতা শব্দটির দেশ ও বিশ্বব্যাপী জন্ম দিতে সাহায্য করেছিলেন। কী পরিস্থিতিতে তিনি বঙ্গবন্ধুর সেই বাংলা মেসেজটির প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করে চট্টগ্রামের ছিলিমপুর স্টেশনে টেকনিশিয়ান আব্দুল কাদেরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে সুগভীর আগ্রহে জানতে চায় 'মরুপলাশ'। সউদীআরব থেকে প্রকাশিত 'মরুপলাশ' পত্রিকার সম্পাদক - ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত রিয়াদে তার ভাড়াটে বাসভবনে একান্ত নিরিবিলি একটি দেশের ইতিহাসের মুখোমুখি বসেন। -২৫মার্চ ২০১০। এর পরপরই জনাব মেজবাহউদ্দিন দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান।

উপরের ছবিতে বাঁয়ে বসা বঙ্গাবন্ধুর 'স্বাধীনতা' শব্দটির জন্মদানে প্রধান সাহায্যকারী (বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা ম্যাসেজটি ইংরেজীতে প্রথম অনুবাদক ও প্রেরক) মেজবাহউদ্দিন জওহের ও ডানে মরুপলাশ সম্পাদক।

যে ইতিহাস নিয়ে গত ৮/৯বছর ধরে বিচ্ছিন্নভাবে 'মরুপলাশ' লিখে আসছে অবিরাম। নিজ ছবি দিয়ে কখনও এই ষাটোর্ধ প্রাণ চাঞ্চল্যে উর্বর, টগবগে তরুণ মেজবাহউদ্দিন এই ইতিহাসের কথা বলতে চাননি। কেননা নিরাপত্তার অভাব। মরুপলাশ এর সঙ্গে তিনি গত প্রায় দেড় দশক ধরেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি প্রবাস কর্মজীবনে মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এমবিসি র প্রকল্প প্রকৌশলী (প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার) হিসেবে কর্মরত। তাই তিনি রিয়াদ প্রবাসী দীর্ঘকাল থেকেই। তিনি লেখেন প্রবন্ধ, গদ্য, গল্প, রম্য কখনও সখনও কবিতার ফুলও ফোটান এই একজন আপাদমস্তক বাঙালি সব্যসাচি লেখক। মরুপলাশ তার একখানি গল্পগ্রন্থ 'কাশফুল' প্রকাশ করেছে। যা রয়েছে বর্তমানে ইন্টারনেট সংস্করণে। তাঁর লেখার প্রতিটি শব্দে যেন চুঁইয়ে চুইয়ে পড়ে গোলাপের পাপড়ি থেকে ভোরের শিশির বিন্দু। তাই তিনি সউদীআরবে মরুপলাশ পাঠকদের কাছে 'রসের হাঁড়ি' নামেই খ্যাত। রিয়াদে তিনি কমন দাদা। মিথ্যের ডামাডোলে যখন সত্য ডুবতে বসেছে। মরুপলাশ এর খোঁচায় খোঁচায়

যখন এ তরুণ জাগলেন, তখনই তিনি তৎপর হলেন। দায় মুক্তির জন্যে তিনি জীবনের শেষ পর্বে এসে মুখ খুললেন। তিনি এ সাক্ষী দিয়েছেন দৈনিক যুগান্তর এ মঙ্গলবার ০৭ জুলাই ২০০৯ প্রতিমঞ্চ পাতায় 'ইতিহাসের খোঁজে' শিরোনামে এবং দৈনিক জনকণ্ঠ বৃহস্পতিবার ০৯জুলাই ২০০৯ইং 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা যাঁরা পৌঁছে দিয়েছিলেন' শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায়। আগে ছিঠেফোঁটা স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা বললেও এবারই বললেন অকপটে বিস্তারিত এবং নিজের লেখা তথ্য সম্বলিত দলিলদস্তাবেজ দিয়ে গেলেন মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম ও বর্ষীয়ান বাংলা প্রকাশনা 'মরুপলাশ' এ। সুপ্রিয় পাঠক আমরা মেজবাহউদ্দিন এর লেখা থেকেই চলুন জেনে নিই সেদিনের সত্য ইতিহাসটুকু ১নং লেখায় এবং ২নং লেখায় রয়েছে স্বাধীনতার ঘোষক বিষয়ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিশ্লেষণ। ইতিহাস বিকৃতির এই কলংকিত সময়ে তিনি ৭১পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিজ দায় মুক্তির জন্যই বলে গেলেন তাঁর কথা।

আমাদের রাষ্ট্রীয় খেতাবগুলো দেশের কত কুলাঙ্গারের নামের সঙ্গে জড়িয়ে লজ্জিত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে। সেই লজ্জা অপমান থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য এই সেই অকুতোভয় মহান মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা শব্দের জন্মদানে প্রথম ও প্রধান সাহায্যকারী মেজবাহউদ্দিন জওহের ও ঘোষক ইতিহাসের সাক্ষী প্রকৌশলী আবদুল কাদেরকে রাষ্ট্রীয় একটি বিশেষ খেতাব দিয়ে সম্মান প্রদর্শন পুর্বক সরকার জাতিকে ঋণমুক্ত করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে মরুপলাশ এর সকল লেখকগন।

সুপ্রিয় পাঠক আমরা মেজবাহউদ্দিন এর লেখা থেকেই চলুন জেনে নিই সেদিনের সত্য ইতিহাসটুকু 'একটি অকথিত কাহিনী'। ইতিহাস বিকৃতির এই কলংকিত সময়ে তিনি '৭১পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিজ দায় মুক্তির জন্যই বলে গেলেন সেই মেসেজটির কথা যা একটি দেশের মানচিত্রই বদলে দিয়েছে।

-১-

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র সম্পর্কিত একটি অকথিত কাহিনী

এখন ১৯৭৭ সাল। যে কাহিনীটির কথা বলতে বসেছি সেটি একাত্তরের। প্রায় সোয়া শতাব্দীতে একটি ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দেয়া খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার-বিশেষ করে ঘটনাটি যদি কোন জাতীয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে হয়। মানুষের স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল- পঁচিশ বছর একটি ঘটনাকে হুবহু ধরে রাখার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে দেননি। তবে ঘটনাটি যেহেতু বিশেষ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা সুতরাং এর মোটামুটি অবয়ব মনের মধ্যে গেঁথে গেছে- যদিও খুঁটিনাটি বহুকিছু হয়ত কালের গর্বে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে। বিষয়টি সম্পর্কে গত পঁচিশ বছরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে লেখালেখি হয়েছে এবং সেই সব লেখায় অবধারিতভাবেই আমার নাম এসেছে-কিন্তু কোন সরকারী- বেসরকারী সংস্থা হতে সরাসরি কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করেননি কিংবা আমার বক্তব্য চাননি। আজ এতদিন পরে কিভাবে কেন আমার বক্তব্য জানার প্রয়োজন হল আমি জানিনা- তবে জানতে যখন চাওয়া হয়েছে আমি যথাসম্ভব অবিকৃতভাবেই সেদিনের ঘটনাগুলো বিবৃতি করার চেষ্টা করব। অবশ্য আমার বক্তব্য হবে সম্পূর্ণই স্মৃতি নির্ভর কারণ সেদিনের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকেই হয়ত এতদিনে হারিয়ে গেছেন।

আমার মুল বক্তব্যে আসার পুর্বে ভূমিকা স্বরুপ কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যাপার আলোচনা করা জরুরী, কারণ এই ভূমিকাটি জানা না থাকলে আর মুল বক্তব্যটি বোঝতে কিছু অসুবিধা হতে পারে। ১৯৭১ সালে আমি তৎকালীন পাকিস্তান টেলিগ্রাফস ও টেলিফোনস ডিপার্টমেন্টে ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার হিসাবে কর্মরত ছিলাম। বর্তমানে বাংলাদেশ টিএন্ডটি বিভাগে এই পদটির নাম পরিবর্তন করে সাব-এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার রাখা হয়েছে। আমি তখন ছিলাম পঁচিশ বছরের এক টগবগে যুবক। আমার কর্মস্থল ছিল মগবাজারের ভি,এইচ,এফ কন্ট্রোল ষ্টেশনে সেখানে আমি পালা প্রধানের দায়িত্ব পালন করতাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাইক্রোওয়েব সিস্টেম চালু হয়নি এবং টেলিযোগাযোগের একমাত্র মাধ্যমে ছিল তখন ভি, এইচ, এফ সিস্টেম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাইক্রোওয়েব সিস্টেম চালু হলে এই সিস্টেমটি উঠে যায়। মগবাজার কন্ট্রোল ষ্টেশনটি ছিল তখন ভি, এইচ, এফ সিস্টেমের হৃদপিন্ড স্বরুপ এখান থেকে চার চারটি লিংক সমগ্র বাংলাদেশকে কভার করছিল। লিংকগুলি ছিল নিম্নরুপঃ-

১. ঢাকা - চাঁদপুর - বেগমগঞ্জ - মিরেরশরাই্ চিটাগাং লিংক

২. ঢাকা - ফরিদপুর - ভাটিয়াপাড়া - খুলনা লিংক

৩. ঢাকা – শ্রীপুর – হবিগঞ্জ – সিলেট লিংক

৪. ঢাকা – শ্রীপুর – ময়মনসিংহ – জামালপুর – বগুড়া লিংকষ্

উপরোক্ত লিংকগুলির মাধ্যমে ঢাকা হতে বিভিন্ন শহরগুলিতে স্বয়ংক্রিয় টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালিত হতো। কন্ট্রোল ষ্টেশনটি অবস্থিত ছিল মগবাজার ওয়ারলেছ কলোনীর অভ্যন্তওে এশটি স্বতন্ত্র প্রাঙ্গানে। প্রদান গেটে দিনরাত পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা ছিল।

আগেই বলেছি, উক্ত ষ্টেশনে আমি একজন পালাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করতাম। দিনরাতের চব্বিশ ঘন্টাকে তিনটি পালায় বিভক্ত করা হয়েছিলো সকাল আটটা থেকে দুপুর দেড়টা, দুপুর দেড়টা থেকে রাত আটটা, রাতা আটটা থেকে পরদিন সকাল আটটা। প্রতিটি পালায় একজন পালাপ্রধান, জনাদুয়েক টেকনিশিয়ান ও একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ডিউটি করতেন। ২৫মার্চ (১৯৭১ইং) রাত আটটা থেকে আমার রাতের পালার ডিউটি ছিল। আমার সাথে ঐদিন রাতে কার কার ডিউটি ছিল- আমি হাজার চেষ্টা করেও আমি আজ আর তা স্মরণে আনতে পারছিনা। তবে রাত আটটায় যখন ডিউটিতে যাই- তখন আমি বেশ উত্তেজিত ছিলাম-কারণ ইতিমধ্যে সারা ঢাকায় একটি গুজব তখন দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়েছে যে, আজ রাতেই বড় ধরণের কোন একটা ঘটনা ঘটতে পারে।

আমি ডিউটিতে যাওয়ার সময়ই দেখতে পাই রাস্তায় মানুষের চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা, লোকজন রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পাকিস্তান সরকারের কর্মচারী হলেও আমি ছিলাম বঙ্গাবন্ধুর একনিষ্ট ভক্ত-শতকরা নব্বইজন বাঙালির মত আমিও তখন বিশ্বাস করতাম যে, স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালি জাতির মুক্তি আসবে না। বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার ও হয়েছিল। টি এন্ড টি এবং রেডিওর অফিসগুলি সবসময়ই স্পর্শকাতর স্থান যে কোন রাষ্ট্রীয় গোলযোগের সময় এই অফিসগুলিই সর্ব প্রথম আক্রান্ত হয়। সুতরাং এই রকম স্পর্শকাতর স্থানে চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে ডিউটি পালন করতে যাওয়াটা সবসময়ই রিস্কি-যে কোন মুহূর্তে সামরিক বাহিনীর আক্রমনের আশঞ্জা থাকে। তবুও চাকুরীর খাতিওে অফিসে যেতেই হলো।

রাত দশটার পর থেকে ঢাকার খবরাখবর জানার জন্য কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রামগত টেলিফোন পেতে থাকি, উৎকণ্ঠা ও তত বাড়তে থাকে। পালার ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী যিনি ছিলেন, তাকে প্রধান গেটে পাঠাই এবং এই নির্দেশ দিই যেন আর্মির আগমনের কোন আলামত দেখলে সাথে সাথে ভেতরে আমাদের খবর দেন। সে ক্ষেত্রে হয়ন প্রাণ বাঁচানোর একটা সুযোগ পেতেও পারি। রাত আনুমানিক বারটার দিকে আকাশ ভেঞ্গে পড়ল। চারিদিকে হতে প্রচন্ড গোলাগুলি ঢাকার নৈশ আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সবচেয়ে ভারী গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছিলো ফার্ম গেটের দিক হতে- মনে হচ্ছিল যেন কামান অথবা ট্যাংকের গোলাগুলির আওয়াজ। ইতিপুর্বে আমার অভিজ্ঞতা ছিল বড়জোর থ্রি নট থ্রি রাইফেল হতে আগত শব্দ, ট্যাংক কিংবা মেশিনগানের ভারী আওয়াজ জীবনের এই প্রথম শুনলাম। আর অফিসে থাকা নিরাপদ নয় বিধায় অফিস পরিত্যাক্ত করে বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাসা ছিল অফিসের কাছেই-নয়াটোলার মোড়ে একটি প্রাইভেট বাসা-মেইন রোড থেকে একটি ছোট্ট গলিপথ দিয়ে কিছুটা ভেতরে। ছোট্ট দু'কামরার একটি দোতলায় আমি এবং আমার বন্ধু ফিরোজ কবির থাকতাম। অফিস পরিত্যাক্ত করে সরাসরি বাসায় চলে আসি।

এরপর সারারাত ঢাকাতে যে তান্ডব চলে বিশ্বের ইতিহাসে চিরদিনের জন্যে তা লেখা হয়ে আছে। সেদিনকার লক্ষ লক্ষ ঢাকাবাসী তার স্বাক্ষী। ঘটনার এই আকস্মিকতায় আমরা দারুনভাবে মুষড়ে পড়ছিলাম। নয়াটোলায় আমাদের বাসাটা রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে খুব একটা দুরে নয়। সেদিক থেকে আগত অবিশ্রান্ত গোলাগুলির শব্দে আমরা ধারণা করেছিলাম যে হয়ত উক্ত অফিসটি আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আর কোথায় কি হচ্ছে তা জানার কোন উপায় ছিল না-বেরিয়ে খবর নেয়ার মত সাহসও পাচ্ছিলাম না। এরুপেই উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর চরম হতাশার মধ্যে কেটে গেল এই বিভিষিকাময় রাতটি। ভোরের দিকে গোলাগুলির শব্দ স্তিমিত হয়ে আসলে-আমরা কয়েকজন (খুব সম্ভববত ফিরোজ কবির, খালেক সাহেব, পাশের বাসার জনৈক বয়স্ক ভদ্রলোক নাম যতদুর মনে পড়ে কালাম সাহেব ফুড ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করতেন ও আমি।) আমাদের বাসার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গানে দাঁড়িয়ে বাঙালিদের এখন কি হবে, শেখ সাহেবের অবস্থা কি-তিনি কি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন-এই সব নিয়ে ফিস ফাস আলাপ করছিলাম। এমন সময় আব্বাস নামক জনৈক রিক্সা ওয়ালা একটি কাগজ আমার হাতে দিল। আব্বাস ছিল বছর বিশেক বয়সের একটি ছেলে রিক্সা চালাতো এবং টুকিটাকি অন্যান্য কাজকর্মও করত। ওর বৌ আমাদের বাসায় ঠিকা কাজ করতো-সেই সুবাদেই আব্বাসের সাথে আমার পরিচয়।

সাদা কাগজে হাতে লেখা একটি অত্যন্ত সাদামাটা লিফলেট মনে হচ্ছিল যেন কার্বনের কপি-অথচ সেই সামান্য কাগজের টুকরাটিই যেন আমার অন্তরে হাজার আলোর ঝলকানি নিয়ে আবির্ভূত হলো। আল হামদুলিল্লাহ! বঙ্গবন্ধু তাহলে শত্রুর হাতে বন্দী কিংবা হত হননি। তিনি নিরাপদে আছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন। সেই অন্ধকার মুহূর্তে এরূপ একটি সংবাদে আমরা যেন নবজীবন ফিওে পেয়েছিলাম বলে মনে হয়েছিল। কাগজটি সে কোথায় পেয়েছে-এই প্রশ্নের জবাবে আব্বাস জানাল সে অবস্থা জানার জন্যে মেইন রোডে যাচ্ছিল। একজন লোক সাইকেল নিয়ে দ্রুতবেগে মধুবাগের দিকে যাওয়ার সময় তাকে কাগজটি দিয়ে গেছে।

অতঃপর দেশের অবস্থা কোন দিকে মোড় নিতে পারে এই আলোচনার এক পর্যায়ে কেউ একজন (খুব সম্ভবত কামাল সাহেব) বললেন- 'মেজবাহ সাহেব, ঢাকায় এই যে নারকীয় ঘটনাটি ঘটল ঢাকার বাইরের কয়টি লোক এ সংবাদটি পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষনাটিও বাহিরের লোককে জানানো দরকার। আপনি তো ওয়ারলেছে চাকুরী করেন, আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারেন না?' তার কথায় আমার মনে তখন আর এক চিন্তা ঝিলিক মেরে গেল। গতকাল রাত বারটায় আমি অফিস পরিত্যাগ করে চলে এসেছি-অফিসের কি অবস্থা জানিনা। অফিসে আর্মি এসে গেছে কিনা তাও জানিনা। একবার অফিসে খোঁজ নেয়া দরকার এবং সম্ভব হলে বঙ্গবন্ধুর বাণীটি বাইরের ষ্টেশনগুলিতে পাঠানো দরকার। পাঠানোর পুর্বে বাংলায়, লেখা বাণীটি অবশ্যই ইংরেজীতে অনুবাদ করতে হবে। কারণ তখনকার দিনে টি এন্ড টি অফিসে যাবতীয় মেসেজ ইংরেজীতে পাঠানোরই রেওয়াজ ছিল। বিশেষ করে বর্হিবিশ্বে পাঠানোর জন্যে তখন মোর্স কোড ব্যবহার করা হতো ইংরেজী ছাড়া যা ছিল অসম্ভব। আমার রুমে বসে বাণীটির ইংরেজী অনুবাদ করি। বাণীটির ইংরেজী অনুবাদ সহ নিম্নে সন্নিবেশিত হলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখানে মেসেজটি যেভাবে উল্লেখিত হলো, তার সাথে অন্যান্য গ্রন্থাদিতে উল্লেখকৃত মেসেজের কিছু গড়মিল থাকতে পারে। কারণ আমি শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভও কওে বাংলাদেশ হতে হাজার হাজার মাইল দুরে বসে এই বক্তব্য দিচ্ছি-সুতরাং মুল মেসেজটি হতে যদি এটি সামান্য এদিক ওদিক হয় তাহলে তা আশ্চর্যের কোন ব্যাপার নয়। বরং হুবহু মিলে যাওয়াটাই আশ্চর্যের ব্যাপার হতো।

যাহোক- মেসেজটি এবার পড়ছিঃ-

"গত মধ্য রাত্রে দুবৃত্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ট্যাংক, মেশিনগান ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র সহযোগে পিলখানার

ই পি আর সদর দপ্তরে ও রাজারবাগের পুলিশ ভবনে অতর্কিতে হামলা পরিচালনা করে এবং শতসহশ্র নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। ঢাকাবাসীরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় শত্রু সেনাদের মোকাবিলা করিয়া যাইতেছে।-------এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইল। প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সর্ব প্রযত্নে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়ুন। আমাদের সংগ্রামে বিশ্বের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরি কের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি। খোদা আমাদের সহায় হোক। জয়বাংলা।"

শেখ মুজিবুর রহমান

২৬শে মার্চ ১৯৭১

-ঃ অনুবাদঃ-

"Last night at about 0000 hrs, Pakistani Army suddenly attacked EPR HQ at Pilkhana & Police Camp at Razarbagh with tanks, machine guns & others heavy weapons Killing hundreds of thousanads of innocent lives. Peoples of Dacca are fighting heroically with the enemy force in the streets of Dacca-----------Declared Independence. People of Bangladesh are asked to resist the enemy force at any cost at every corner of the country. Seek all possible help from the peace-loving people of the world. May God Bless you. Joii Bangla."

Sheikh Mujibur Rahman

March 26,1971

অনুবাদ শেষে আমরা অফিসের দিকে রওয়ান করলাম। আমার সহযাত্রী ছিলেন বন্ধু ফিরোজ কবির। তখন সবেমাত্র সূর্যও উঠেছে, রাস্তা একদম ফাঁকা। দূর হতে দেখতে পেলাম কন্ট্রোল ষ্টেশনের গেটে কোন লোক নাই-আশে পাশে আর্মি কিংবা পুলিশের কোন চিহ্নও নেই। দুরু দুরু বুকে খাঁচার ভেতর ঢুকলাম। স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিটারগুলি যথারীতি চলছে এবং বিভিন্ন সার্ভিস চ্যানেল হতে বাজারের আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রথমেই কন্ট্রোল রুম। কন্ট্রোলরুমের কন্ট্রোল কনসোলের হ্যান্ডসেট যখন ধরলাম তখন দেখলাম সবগুলি সার্ভিস চ্যানেলে বাইরের ষ্টেশনগুলি হতে সমানে ঢাকাকে ডাকছে এবং রিং দিচ্ছে। প্রথমেই চিটাগাংকে নিলাম। চিটাগাংয়ের ষ্টেশনটি অবস্থিত ছিল ফৌজদারহাটে-জায়গাটির নাম ছিলিমপুর। সত্তর সনে আমি বছরখানেকের মত সেখানে কাজ করেছিলাম-সেই সুবাদে সেখানকার প্রায় সব ষ্টাফই আমার পরিচিত। আব্দুল কাদের নামক একজন টেকনিশিয়ান লাইনে ছিলেন-আমার পূর্ব পরিচিত এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে বললাম-শেখ সাহেবের একটা মেসেজ আছে-তাড়াতাড়ি টুকে নিন। মেসেজটি তিনি লেখার পর তাকে বললাম- মেসেজটি যেন সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় এবং কিছুতেই যেন মেসেজবুকে এন্ট্রি করা না হয়।

অতঃপর একইভাবে খুলনা, সিলেট ও বগুড়া লিংকেও মেসেজটি পাঠালাম। উক্ত লিংকগুলিতে কে কে রিসিভ করেছিলেন তা এখন আর মনে নাই। মেসেজটি প্রচারের সময় আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিলেন ফিরোজ কবির। আরও দু'একজন লোক সেই সময় কন্ট্রোলরুমে এসেছিলেন-তবে তাদের নামগুলি আমি এখন আর স্মরণ করতে পারছিনা। খুব সম্ভবত আব্দুল হামিদ নামক একজন টেকনিশিয়ান সেই সময় আমাদের পাশে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাকে সাহায্য সহযোগীতা করেছিলেন। হামিদ বর্তমানে টিএন্ডটি'র একটি ট্রেড ইউনিয়নের নেতা সেই সময় অনেকদিনই একসঙ্গে ডিউটি করেছি এবং তিনি আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তবে এ ব্যাপারে আমি হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত নই।

এবার আমার কাহিনীর ২য় পর্বে প্রবেশ করি। মেসেজটি প্রেরণ করার পর আমরা তড়িঘড়ি করে বাসায় চলে আসি। এরপর নয়মাস ধওে বাংলাদেশের বুকে কি কি ঘটনা ঘটেছিল-সকলেই কমবেশী তা জানেন। পাকিস্তানি আর্মি সব কিছু দখল করে নিল, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। ২৬শে মার্চ সকালে আমি বঙ্গবন্ধুর যে ঘোষণাটি প্রেরণ করেছিলাম- তার কার্যকারিতা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। বলতে গেলে এটির কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ইংরেজীতে যাকে বলে ফিডব্যাক-তা না থাকাতে আমার পক্ষে এর ফলাফল সম্পর্কে জানার কোন সুযোগও ছিলনা।

যাহোক নয়মাস যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলো-বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসলেন। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার ও বেশ কয়েকমাস পরে আমার বন্ধু আব্দুল কাদের চিটাগাং ঢাকা আসেন আমার সাথে দেখা করার জন্যে। ইনিই সেই আব্দুল কাদের যিনি ২৬শে মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর মেসেজটি আমার কাছ থেকে রিসিভ করেছিলেন। কাদের প্রথমেই যে অনুযোগ করেন সেটি হলো- আমি এখানে ঢাকায় বসে বসে কি করছি। চিটাগাংয়ের কতলোক সেই মেসেজের বদৌলতে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে ছবি তুলছে-প্রমোশন নিচ্ছে। যে কিনা মূল অরিজিনেটর তারই কোন পাত্তা নাই। কাদেরের কথা শুনে আমি অবাক। সেই মেসেজটা যে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে , কিভাবে একটা দেশের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না।

যাহোক কাদেরের কাছ থেকে সেই কাহিনী শুনলাম। আমার কাছ থেকে মেসেজটি রিসিভ করেই ওরা চট্টগ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা জহুর আহম্মেদ ও হান্নান সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেই মেসেজের উপর ভিত্তি করেই প্রথমে হান্নান সাহেব ও পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান সাহেব কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। এ ছাড়াও ছিলিমপুর ওয়ারলেছ ষ্টেশনের V.H.F ও WT কেবিন (Wireless Telegraphy) হতে মেসেজটি উভয় ফ্রিকুয়েন্সিতে প্রচার করা হয় যা কিনা বর্হিনোঙ্গারে অবস্থিত আমেরিকান জাহাজ এম ভি সালভিষ্টা, ভারতীয় জাহাজ ভি ভি গিরি, ক্যালকাটা শিপিং কন্ট্রোল ইত্যাদি সংস্থা রিসিভ করে। এর উপর ভিত্তি করেই ভয়েস অব আমেরিকা তাদের রাত দশটার খবওে প্রচার করে যে, শেখ মুজিব কোন এক অজ্ঞাত স্থান হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। যা হোক যাদের কাছ থেকে সবকিছু শুনে আমি সেদিন প্রকৃতপক্ষেই রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলাম এবং একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত ভাবতে পেরে গর্ববোধ করেছিলাম।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এল। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় না লিখলে হয়ত আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেল বলে মনে হবে। অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে এতবড় একটি ঘটনা এতদিন কেন আমি চেপে রেখেছি। এর উত্তওে আমি সবিনয়ে বলতে চাই যে, ঘটনা চেপে রাখার আমি কে? সত্য স্বয়ং প্রকাশিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে কোথাও কিছু লিখিনি।- এটা সত্য। তবে এর পেছনে মুখ্য যে কারনটি বিদ্যমান তা হলো এই যে, সত্তরের দশকে আমার সামাজিক অবস্থান যা ছিল তার বিনিময়ে দায়িত্বশীল কিংবা সমাজের উচুস্তরের কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা আমার ছিলনা। চেষ্টা করেছি, কিন্তু সংযোগের অভাবে কোথাও কৃতকার্য হতে পারিনি। এ ব্যাপারে সংবাদপত্র বহু লেখালেখি হয়েছে যার সবগুলিই ছিল আমার ব্যক্তিগত সংস্পর্শ বর্জিত। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যেটির কথা মনে পড়ে সেটি হলো দৈনিক ইত্তেফাকের স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা খুব সম্ভবত ’৭২ কিংবা ’৭৩সালের উক্ত সংখ্যায় চিটাগাংয়ের মইনুল হোসেন (কিংবা মইনুল আলম) নামক জনৈক সাংবাদিক একটি ফিচার লিখেছিলেন। ফিচারটির নাম খুব সম্ভবত **”যে কথা আজও বলিনি”** । উক্ত লেখায় তিনি আমাদের মেসেজটি পুরো ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত সংখ্যাটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। ভেবেছিলাম, আমি যেহেতু ঘটনাটির প্রাণকেন্দ্রে আছি। সুতরাং প্রকৃত তথ্য জানতে কেউ না কেউ আমার কাছে আসবেই। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, গত পঁচিশ বছরেও কেউ আসেনি। এখন আমি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি-সমাজের কাছ থেকে চাওয়া-পাওয়ার কোন কিছু আর অবশিষ্ট নাই। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর মনে হয়েছিল-দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমরা যারা দেহ-মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করেছিলাম-তারা কি ভুল করেছিলাম? আমার এ প্রশ্নের জবাব পেতে হয়ত আরও বহু বছর পেরিয়ে যাবে-দেশটা যদি মঙ্গালের পথে কল্যানের পথে অগ্রসর হতে পাওে তবেই কেবল বলা যাবে যে, একাত্তরে আমরা সঠিক কাজটিই করেছিলাম।

স্বাক্ষর-

(মেজবাহ উদ্দিন)

রিয়াদ, সৌদীআরব।

ঠিকানাঃ দেশে এবং প্রবাসে

Bangladesh

Apartment# A-2

House # 17, Road # 04

Gulshan-1 Dhaka-1212

Tel# +88 988 48 48

Saudi Arabia

MBC Group

Mekkah Khurais Road

Riyadh-11554

Kingdom of Saudi Arabia

Tel# +966 55 899 3976

-২-

স্বাধীনতার ঘোষক তত্ত্ব

তত্ত্ব বা থিওরী বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যবহৃত একটি শব্দ যা সাধারনতঃ অগ্রজ বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করে থাকেন। তবে শুধুমাত্র বিজ্ঞানীরাই এর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করবে- আর কারও কিছু করার থাকবে না- তা মেনে নেয়া যায় না। সুতরাং পলিটিকাল নেতানেত্রীরাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন। হিসেব করলে দেখা যায়, তত্ত্ব উদ্ভাবনে জাতীয়তাবাদী নেতানেত্রীরা অন্যদের চাইতে অনেক এগিয়ে আছেন। হালফিলের জাতীয়তাবাদী তত্ত্বসমুহের মধ্যে যেগুলি উল্লেখ্যযোগ্য সেগুলো হলো- সাকা চৌধুরীর 'কুকুরের লেজ নাড়া তত্ত্ব', প্রয়াত সাইফুর রহমান সাহেবের 'খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন দেশের অগ্রগতির জন্য ক্ষতিকর' শীর্ষক তত্ত্ব, দেশনেত্রীর 'জন্মদিন সঞ্চালন তত্ত্ব' এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবিদের উদ্ভাবিত 'স্বাধীনতার ঘোষক তত্ত্ব'। যেহেতু এখন মার্চ মাস চলছে, সুতরাং আজকের লেখাটিতে স্বাধীনতার ঘোষক তত্ত্ব নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করা যায়।

এই তত্ত্বটি প্রপোজ করা হয় ৯১-৯৬ সময়কালে, ম্যাডাম জিয়ার প্রথম মেয়াদে। এই তত্ত্বে প্রস্তাব করা হয় যে শেখ মুজিব নয়, মেজর জিয়াই একাত্তরের সাতাশে মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই সুবাদে মেজর জিয়াই হচ্ছে স্বাধীনতার মহান ঘোষক। নাম না জানা এক অখ্যাত মেজরের ডাকেই বাঙালিরা পাগলের মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং দেশটাকে স্বাধীন করে ফেলে! এই তত্ত্বের একটি মারাত্মক ছিদ্র ছিল, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম 'লুপ-হোল'। যখন প্রশ্ন করা হতো যে জিয়াই যদি স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে থাকেন এবং ২৭শে মার্চ ঘোষণাটি দিয়ে থাকেন, তা'হলে স্বাধীনতা দিবস তো ২৭শে মার্চ হওয়ার কথা। তা না হয়ে ২৬শে মার্চ হলো কেন? এই বেয়াড়া প্রশ্নের কোন তাৎক্ষনিক জবাব জাতীয়তাবাদীদের ছিল না। এমন প্রশ্নের মুখে অনেক ঝানু ঝানু জাতীয়তাবাদীকেও খামুশ হয়ে তর্কযুদ্ধ হতে তড়িঘড়ি পিছু হটতে দেখা গেছে। এর প্রতিবিধান কিভাবে করা যায়, তা ভাবতে ভাবতেই সেবারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

ছিয়ানব্বুইর নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হলে ঘোষণাতত্ত্বটি সাময়িকভাবে ঝুলে যায়। এলো ২০০১ সাল। বিখ্যাত লতিফিয় নির্বাচনে দুইতৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর তাদের মনে হলো যে অবস্থার পার্মানেন্ট একটি সুরাহা করা দরকার। লতিফের আশীর্বাদে তারা সাংবিধানিকভাবে যা খুশী তাই করার ক্ষমতা রাখে, দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির জোরে সংবিধান পরিবর্তন করে তারা যদি ঘোষণা দেয় যে বাংলাদেশের সবাই মহিলা প্রজাতির জীব তা'হলেও কারও বলার কিছু নেই। এমতবস্থায় ভবিষ্যতে আর যেন কোন অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখী না হতে হয় তা নিরসনকল্পে তারা ঘোষণার দিনটি একদিন এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিল। ঘোষণা দিলো- ২৭শে মার্চ নয়, ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পরই জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণাটি দিয়েছিলেন!

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দিনতারিখ সুবিধামতো এগিয়ে নিয়ে আসাটা জাতীয়তাবাদী অভিধানে দোষের কিছু নয়। তাদের আপোষহীন নেত্রী ইতিমধ্যেই 'জন্মদিন সঞ্চালন তত্ত্বে'র মাধ্যমে নিজের জন্মতারিখ ৫ই সেপ্টেম্বার থেকে ১৫ই আগস্টে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং ২৭শে মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ এগিয়ে নিয়ে আসলে তেমন দোষের কি আছে? মুশকিল বাধলো জিয়ার আমলে লিখিত এবং হাসান হাফিজুর রহমান কতৃক সংকলিত স্বাধীনতার দলিলপত্রগুলি। সেগুলিতে যে প্রকৃত তথ্য সংরক্ষিত আছে। সিদ্ধান্ত হলো- পুরাতন ইতিহাস সংশোধন করে নুতনভাবে লিখতে হবে। সুতরাং হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত সমস্ত দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত করে ২০০৩ সালে নুতনভাবে স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হলো এবং নব-উদ্ভাবিত ঘোষকতত্ত্বকে রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রে সন্নিবেশিত করা হলো।

ঘোষণাটি যে জিয়া ২৭শে মার্চ বিকেলে দিয়েছিলেন ২৫শে মার্চ নয়, একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ বিষয়ে অতীতে এত বেশী লেখালেখি হয়েছে যে এর উপর আর কিছু আলোচনা করা সময়ের অপচয় মাত্র। তবুও তরুন প্রজন্মের মনে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসটি বদ্ধমুল করার জন্য বিশেষ বিশেষ জাতীয় দিনগুলিতে বিষয়টির উপর আলোচনা হওয়া জরুরী। এই বিবেচনা থেকেই কিছু বাছাই করা প্রামান্য তথ্য নিয়ে অত্র প্রবন্ধটি সাজানো হলো।

একটি জাতির স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ কতৃত্ব উক্ত জাতির কোন সর্বজনস্বীকৃত নেতার হাতেই সংরক্ষিত থাকে, আর কারও হাতে নয়। একাত্তরে বাংলাদেশের জাতীয় নেতা ছিলেন- মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান। বয়স ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় ভাসানী অনেক সিনিয়র ছিলেন, শেখ মুজিব এক সময়ে মাওলানার সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করেছেন। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুজিব তার রাজনৈতিক মুরুব্বীকে অতিক্রম করে

বাংলাদেশের মানুষের মনে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশেবিদেশে মুজিবের ইমেজ এতটাই গগনচুম্বি হয়ে দাড়ায় যে মুজিব ও বাংলাদেশ সমার্থক হয়ে যায়। "এক নেতা এক দেশ - বঙ্গাবন্ধু বাংলাদেশ"- উনসত্তর-সত্তরে এটাই ছিল বাঙালি জনগণের সর্বজনপ্রিয় শ্লোগান। সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের দল আওয়ামী লীগ ছাড়া আর সব দল বলতে গেলে পুর্ব বাংলার মাটি হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উক্ত নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৭টি আসনে বিজয়ী হয়ে মুজিব বাংলাদেশের জনগণের একমাত্র বৈধ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

সঙ্গাত কারণেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পুর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুজিবের সাথেই আলোচনা চালিয়ে যায়। ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত মুজিবই ছিল পুর্ব বাংলার ডি-ফ্যাক্টো শাসক। পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্ণর হাউসে নামকা ওয়াস্তে পুর্ব পাকিস্তানের জন্যে একজন গভর্নর ছিল, মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে ছিল একজন মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল মুজিবের হাতে। তারই নির্দ্দেশে সরকারি অফিস চলত, তারই নির্দ্দেশে কর্মচারিরা বেতন পেত, তারই নির্দ্দেশে ব্যাংকগুলি পরিচালিত হতো। এমনকি সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্টগুলিও পরিচালিত হতো তারই নির্দ্দেশে। বিদেশী পত্রপত্রিকায় এমন রিপোর্টও তখন ছাপা হয়েছে যে 'ঢাকা শহরে একমাত্র গভর্ণর হাউস ও ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে না, কোথাও পাকিস্তানের শাসন কার্য্যকরী নেই। পুর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত শাসনক্ষমতা এখন ধানমন্ডীর বত্রিশ নম্বর সড়কে'।

এমন একটা অবস্থায় মুজিবের মুখনিঃসৃত কোন নির্দ্দেশ ছাড়া আর কারও নির্দ্দেশ বাঙালীরা মানবে না, বিশ্ববাসীর কাছে তা বৈধ বলেও বিবেচিত হবে না- একথা পাগলেও বুঝতে পারে। **তাই দেখা যায়- বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চের জনসভার কয়েকদিন পর মাওলানা ভাসানী পল্টনে এক জনসভা করেন। উক্ত জনসভায় মাওলানা ভাসানী মুজিবকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার উদাত্ত আহ্বান জানান, বলেন- 'মুজিব আর দেরী নয়, অবিলম্বে পুর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করো'। অর্থাৎ কাংখিত ঘোষণাটির জন্যে মাওলানাকে তারই এককালের শাগরেদের দিকে চেয়ে থাকতে হচ্ছে, তিনি নিজ হতে ঘোষণাটি দিতে পারছেন না।** কারন তিনি জানতেন, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ এখতিয়ার কেবল মুজিবেরই আছে, আর কারও নয়। আর কেউ ঘোষণাটি দিলে শুধু যে বাংলাদেশের মানুষের কাছেই তা গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হবে তাই নয়, বিশ্ববাসীর কাছেও তার কোন লিগাল ষ্ট্যান্ডিং থাকবে না। এমতবস্থায় প্রায় চল্লিশ বছর পর কেউ যদি দাবী করে বসে যে ২৫শে মার্চ মধ্যরাত পর্য্যন্ত যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একজন নিবেদিতপ্রাণ মেজর হিসেবে কর্মরত ছিলেন, হঠাৎ করেই তার মনে দেশপ্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং তিনি বেতার মারফৎ একটা ঘোষণা দেয়ার ফলেই জনগণ পাগল হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং দেশটিকে স্বাধীন করে ফেলে- -এরূপ দাবীকে দয়িত্বজ্ঞানহীন উন্মাদের প্রলাপ ছাড়া আর কোন বিশেষণে বিভুষিত করা যায়?

২৫শে মার্চ তিনি গ্রেফতার হতে যাচ্ছেন এই সংবাদ মুজিব পুর্বাহ্নেই টের পান এবং তার সহকর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার নির্দ্দেশ দেন। গ্রেফতারের পুর্বেই তিনি বহুপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি দিয়ে যান। কীভাবে এই ঘোষণাটি ঢাকা হতে বাইরে পাঠানো হয়েছিল, এই প্রেরণপ্রক্রিয়ার সাথে কারা কারা জড়িত ছিল- তার বিস্তারিত বিবরণ গত উনচল্লিশ বছর ধরে পত্রপত্রিকায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত (যেমন তৎকালীন মগবাজারস্থ ভিএইচএফ কন্ট্রোল ষ্টেশনে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার মেজবাহউদ্দিন, রেডিও টেকনিশয়ান আব্দুল হামিদ ও ফিরোজ কবির, চট্টগ্রামের সেলিমপুরস্থ ওয়ারলেছ ষ্টেশনে কর্মরত আব্দুল কাদের, মাহফুজ, জুলহাস প্রমুখ কর্মচারি-কর্মকর্তাবৃন্দ। এসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্যে পড়ুন- দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন চট্টগ্রাম সংবাদ-দাতা জনাব মইনুল আলমের স্মৃতিচারণমুলক জবানবন্দী **'যে কথা আজও বলিনি'**, প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক ইত্তেফাকের স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায়- ১৯৭৩ সালে। স্মর্তব্য- সবেমাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন, স্মৃতি এবং দেশপ্রেম একদম টাটকা-টগবগে। রাজনীতির কলুষতা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি তখনও, বাঙালি জাতির এমন বেদনাদায়ক বিভক্তির কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি সেদিন। লেখক তাই সেদিনকার ঘটনার অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এবং তথ্যনির্ভর বর্ণনা দিতে পেরেছেন তার লেখায়। ২৬ তারিখ সকালে বঙ্গাবন্ধুর মেসেজটি কীভাবে ঢাকার মগবাজার অয়ারলেছ ষ্টেশন হতে ছিলিমপুরের কোস্টাল ষ্টেশনের কর্মচারীরা রিসিভ করে, কীভাবে সেটা চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রেরণ করা হয়, কীভাবে তা হ্যান্ডবিলের আকারে রাস্তায় রাস্তায় বিলি করা হয়, কীভাবে তা ক্যালকাটা শিপিং কন্ট্রোলের কাছে পাঠানো হয়, কীভাবে তা বহির্নোঙ্গারে অবস্থানরত ভারতীয় জাহাজ ভিভি গিরি এবং আমেরিকান জাহাজ এমভি সালভিস্টা'র কাছে পাঠানো হয়, কীভাবে ভয়েস অব আমেরিকা ঐদিন রাত দশটার খবরে প্রচার করে যে বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, শেখ মুজিব এক অজ্ঞাত স্থান থেকে দেশটির

স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন- -সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে লেখাটিতে)। তাদের অগনিত রচনা, স্মৃতিকথা, অডিও ভিডিও সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিষয়টি চিরকালের জন্যে প্রমানিত হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর উক্ত ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই চট্টগ্রাম বেতারে কর্মরত বেতারকর্মী আবুল কাশেম সন্দীপ, বেলাল মোহম্মদ, প্রকৌশলী আব্দুশ শাকের, প্রকৌশলী শরফুজ্জামান প্রমুখরা কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র হতে ঘোষণাটি প্রচারের উদ্যোগ নেন এবং ২৬ তারিখ দুপুরের মধ্যেই প্রয়াত আব্দুল হান্নান বাণীটি কালুরঘাট রেডিও ষ্টেশন হতে পাঠ করেন। একজন আর্মির লোকদ্বারা ঘোষণাটি পাঠ করানো গেলে জনগণ দারুনভাবে উদ্দীপ্ত হবে- এই ধারণায় বেতার কর্মীগন একজন আর্মি পার্সোনেলের খোঁজ করতে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় তারা প্রথমে মেজর রফিকের (বীরোত্তম) শরণাপন্ন হন। মেজর রফিক পাকিস্থান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে কালুরঘাট যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। বেতার কর্মীরা তখন ষোলশহরে অবস্থানরত আরেকজন আর্মি অফিসারের খোঁজ পান (মেজর জিয়া)। বেলাল মোহম্মদদের আমন্ত্রনে জিয়া কালুরঘাট আসেন এবং ২৭ তারিখ বিকেল ৭টা ৪০মিনিটে প্রথমবারের মতো তা পাঠ করেন। বেলাল মোহম্মদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের লেখায় এই ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ জাতীয় সংবাদপত্রে ও অন্যান্য মিডিয়ায় বহুবার প্রচারিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট রথীমহারথীরা যারা মেজর জিয়ার কথিত ঘোষণাটির সাথে প্রতক্ষ্যভাবে জড়িত ছিলেন- এ প্রসংগে অতীতে তারা কী বলেছেন সেইদিকে একবার একটু চোখ বুলানো যাক।

***বিএনপি নেতা কর্নেল অলি** তার "আমার সংগ্রাম আমার রাজনীতি" নামক স্মৃতিচারণমুলক গ্রন্থে লিখেছেন- "সব কিছু চিন্তা ভাবনা এবং পর্য্যালোচনার পর আমরা সুপরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র দখল করলাম। মেজর জিয়া জীবনের ঝুকি নিয়ে **২৭শে মার্চ** বিকেল বেলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। আমি তার পাশেই বসা ছিলাম"।

***বিএনপি নেতা মীর শওকত আলী** এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- 'বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা যেটা নিয়ে সবসময় বিতর্ক চলতে থাকে জেনারেল জিয়া করেছিলেন না আওয়ামী লীগ থেকে করেছে। আমার জানা মতে, সবচাইতে প্রথম **বোধ হয়** চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিল। এটা ২৬শে মার্চ ১৯৭১ অপরাহ্ন দু'টার দিকে হতে পারে। কিন্তু চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রেরক যন্ত্র খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু পুরো দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তা'হলে আমি বলব যে হান্নান ভাইয়ের সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ '৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণা প্রচারের পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপুর্ণ মোড় নেয়'। (পাঠক, একবার ভাবুন তো ! হান্নান ভাইয়ের ঘোষণার সময় প্রেরক যন্ত্রের ক্ষমতা কম থাকাতে খুব কম লোকেই তা শুনতে পেল। কিন্তু পরদিন মেজর জিয়া যখন সেই একই যন্ত্রে ভাষণ দিলেন, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্য্যন্ত সব লোকেই তা শুনতে পেল এবং মুক্তিযুদ্ধ গুরুত্বপুর্ণ মোড় নিল! এটি কি চরম হাস্যকর ও পরস্পরবিরোধী যুক্তি নয় পাঠকপাঠিকাবৃন্দ?)

***নিয়াজির প্রেস সেক্রেটারি সিদ্দিক সালিক** তার উইটনেছ টু সারেন্ডার গ্রন্থে লিখেছেন- ২৫ শে মার্চ রাত্রে ঢাকায় যখন পাকিস্তানী বাহিনীর "প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিওর সরকারী তরঙ্গের (ওয়েভলেঙ্গাথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ডকৃত। তাতে শেখ মুজিব পুর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন"।

***শমশের মবিন চৌধুরি** (জোট সরকারের প্রতাপশালী সচিব ও খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা) এক সাক্ষাৎকারে বলেন (তারিখ-২০/১০/৭৩, দ্রষ্টব্য- মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, পৃষ্ঠা-৫৯)- "২৬শে মার্চ ভোরে আমরা কালুরঘাটের আর একটু দুরে গিয়ে পৌছলাম। সেখানে আমরা বিশ্রাম নিলাম এবং রিঅর্গানাইজেশন করলাম। ২৬শে মার্চ এভাবে কেটে গেল। ২৭শে মার্চ সন্ধার সময় মেজর জিয়াউর রহমান চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং ভাষণ দিলেন। ২৮শে মার্চ সারাদিন আমি ঐ ভাষণ বেতার কেন্দ্র থেকে পড়ি"।

*তৎকালীন **শিল্পসচিব একেএম মোশাররফ হোসেন** (জোট সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন) তার আত্মীয় চট্রগ্রামের এম আর সিদ্দিকীর কাছে ২৫শে মার্চ সন্ধায় বঙ্গাবন্ধুর একটি মেসেজ পাঠান- "লিবারেট চিটাগাং, টেক অভার এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রসিড ফর কুমিল্লা"। জনাব মোশাররফ হোসেন যে বঙ্গাবন্ধুর এই অর্ডারটি পাঠিয়েছিলেন- ১৯৯০ সালে সচিব থাকাকালীন তা তিনি একটি দাপ্তরিক পত্রে স্বীকার করেন (পত্র নং-সচিব/শিল্প-৬৩/৯০ তাং-৭/৩/১৯৯০)।

***সাংবাদিক আতাউস সামাদ** ২৫শে মার্চ রাত্রে গ্রেফতারের পুর্বক্ষনে বঙ্গাবন্ধুর সংগে ছিলেন। আতাউস সামাদ বঙ্গাবন্ধুকে সাম্ভাব্য আক্রমনের কথা বলাতে তিনি বলেন- আমরাও প্রস্তুত। "আই হ্যাভ গিভেন ইউ ইন্ডেপেন্ডেন্স, নাউ প্রিজার্ভ ইট" (আজকের কাগজ- ২২/১/৯৩)।

এবার দেখা যাক **স্বয়ং জিয়াউর রহমান** এ প্রসঙ্গো কী বলে গেছেন। পাঠক- স্মরণ রাখবেন মুজিব-হত্যার পর জিয়া সুদীর্ঘ্য ৬ বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন এবং একজন সামরিক একনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিরংকুশ ক্ষমতা তার হাতে ছিল। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি যে কেবল হত্যাকাজের মতো অপরাধকেই সাংবিধানিকভাবে বৈধ করে গেছেন তাই নয়, তিনি কলমের এক খোঁচায় সংবিধানের মৌলিক চরিত্রই পাল্টিয়ে দিয়েছিলেন। এহেন ক্ষমতাশালী একজন একনায়ক তার জীবৎকালে স্বাধীনতা ঘোষণাতত্ত্বের বিষয়ে কী বলে গেছেন ?

জিয়াউর রহমান মেজর রফিকদের মতো খুব একটা লেখালেখির ধার ধারতেন বলে মনে হয় না। তার লেখ্য বক্তব্য বড় একটা নাই। বঙ্গাবন্ধু হত্যার পর এক অস্থির ও বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে জাতির কান্ডারি হন তিনি, সুতরাং লেখালেখি নিয়ে সময় কাটানোর অবকাশ তার না থাকারই কথা। ছিটেফোটা যা কিছু পাওয়া যায় সেসব সারসংক্ষেপ করলে ঘোষণাতত্ত্ব সম্পর্কে তার বক্তব্য নিম্নরূপ-

*১৯৭৭ সালের বিজয় দিবসের প্রাক্কালে (১৫ই ডিসেম্বার) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন- "এই পবিত্র মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে **১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের কথা,** যেদিন চট্রগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আমার বলবার সুযোগ হয়েছিল। সেই একই জাতীয়তাবাদী চেতনা, সাহস ও প্রত্যয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি"।

*১৯৭৪ সালের ২৬শে মার্চ অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় তার একটি নিবন্ধ ছাপা হয়- **"একটি জাতির জন্ম"**। উক্ত নিবন্ধে তিনি বঙ্গাবন্ধুকে শুধু জাতির জনক বলেই ক্ষ্যান্ত হননি, ২৫শে মার্চ রাত্রে তিনি কোথায় ছিলেন কী করেছিলেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও দিয়েছেন। নবীন পাঠকদের অবগতির জন্যে উক্ত প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না- "তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫শে ও ২৬শে মার্চের মধ্যে কালোরাত। রাত এগারটায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিল নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্রগ্রাম বন্দরে গিয়ে কর্ণেল আনসারির কাছে রিপোর্ট করতে।... আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্যে একজন লোক ছিল। ---আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এমন সময় সেখানে হাজির হলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরি। ক্যাপ্টেন অলি আহম্মদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দুরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে। এটা ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহনের চুড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম- 'উই রিভোল্ট'- আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহরে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেফতার করো। ..আমি আসছি। ..... ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেঃ কর্ণেল এম.আর.চৌধুরির সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। ..তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম- ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে।.....সময় ছিল অতি মুল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। ....আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দ্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।......তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাঙলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনদিন ভুলবে না"। পাঠক, ভেবে দেখুন - **জিয়াউর রহমান তার জবানবন্দীতে ২৫শে মার্চ রাত এগারটা থেকে রাত ২টা ২৫ মিনিট পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন, কি করেছেন, কার কার সঙ্গো কথা বলেছেন সবকিছুর নিখুত বর্ণনা দিয়েছেন। তার কথ্য বা লেখ্য বক্তব্যে কোথাও বলেননি বা সামান্যতম ইংগিতও দেননি যে তিনি ঐ রাতে কালুরঘাট গিয়েছিলেন এবং রেডিও মারফৎ ঘোষণাটি দিয়েছিলেন।** বরং তার এবং তার ঘনিষ্ট সহচরদের কথায় একথা স্পষ্টভাবে প্রমানিত যে কালুরঘাট থেকে ঘোষণাটি তিনি পাঠ করেছিলেন ২৭শে মার্চ বিকেলে, ২৫শে মার্চ রাত্রে নয়, ২৬শে মার্চও নয়। তা'হলে নব্য জাতীয়তাবাদীরা তেত্রিশ বছর পরে দুই হাজার চার সালে এসে কীভাবে এই আজগুবি থিওরি নিয়ে হাজির হয় এবং দাবী করে যে জিয়া ২৫শে মার্চ রাত্রেই ঘোষণাটি করেছিলেন ! এ যেন সেই গ্রাম্য কৃষকের গল্প- যার গাই সে বলছে বাঁজা, প্রতিবেশীরা বলছে বছর বিয়ানি।

এবার দেখা যাক- ২৭শে মার্চ কালুরঘাট থেকে জিয়াউর রহমান কী ঘোষণা দিয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের অবগতির জন্যে মুল ঘোষণাটি হুবহু তুলে ধরছি-

"The Government of the sovereign state of Bangladesh on behalf of our Great Leader, the Supreme Commander of Bangladesh Sheikh Mujibar Rahman. We do hereby proclaim the independence of Bangladesh & that the government headed by Sheikh Mujibar Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibar Rahman is the sole leader of the elected representatives of seventy five million people of Bangladesh and the government headed by him is the only legitimate government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh which is legally & constitutionally formed and is worthy of being recognized by all the governments of the world. I, therefore, appeal on behalf of our great leader Sheikh Mujibar Rahman to the governments of all democratic countries of the world , specially the big powers & the neighboring countries to recognize the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan. To dub out the legally elected representative of the majority of the peoples as secessionist is a crude joke and contradiction to truth which should befool none. The guiding principle of the new state will be first neutrality, second peace & third friendship to all & enmity to none. May Allah help us. Joy Bangla."। (রেফারেন্স- রেডিও বাংলাদেশের ট্র্যান্সক্রিপশন সার্ভিস কর্তৃক সংরক্ষিত মেজর জিয়ার স্বকণ্ঠ ভাষণের অডিও টেপ)।

জিয়াউর রহমানের আমলে স্বাধীনতা যুদ্ধের মুল্যবান দলিলপত্র সংরক্ষনের জন্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রখ্যাত কবি হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়; স্বাধীনতা যুদ্ধের মুল্যবান দলিলপত্র ও তথ্যাদি সংগ্রহ ও সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৫ খন্ডের এই দলিলপত্রের প্রথম ৬টি খন্ড জিয়াউর রহমানের জীবৎকালেই সম্পাদিত ও পুস্তকাকারে প্রকশিত হয়। বাদবাকী ৯টি খন্ড প্রকাশিত হয় জিয়ার মৃত্যুর পর- ১৯৮৬ সালে। তৃতীয় খন্ডে বঙ্গবন্ধু কতৃক স্বাধীনতা ঘোষণা ও মেজর জিয়া কতৃক কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে তা পাঠ করার বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত খন্ডটি জিয়ার আমলেই সম্পাদিত হয়েছে, তিনি কখনও এতে তথ্যগত কোন ভুল আছে বলে শনাক্ত করেননি ! (সুত্র: হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, তৃতীয় খন্ড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১-২)।

এত সমস্ত তথ্যপ্রমান একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করে যে ঢাকা থেকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রেক্ষিতেই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে ছাব্বিশে মার্চ প্রয়াত আব্দুল হান্নান এবং ২৭শে মার্চ জিয়াউর রহমান ঘোষণাগুলি পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুর চুড়ান্ত নির্দ্দেশ না পেয়ে কোন সেনানায়ক স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন না। কারন সেক্ষেত্রে যদি কোন রাজনৈতিক মীমাংসা হয়ে যায় তবে সেনানায়কের কোর্ট মার্শাল অবধারিত।

এর পক্ষকাল পরে ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় যারা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করে। মুক্তযুদ্ধকালীন নয় মাসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারই ছিল বাংলাদেশের আইনানুগ অথারিটি। এই সরকার গঠিত হয় বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৫শে মার্চ প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণার বলে। বিষয়টি পরবর্তীতে বাংলাদেশের সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটিই আমাদের সংবিধানের মুল ভিত্তি, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্মের আইনানুগ অধিকার এই ঘোষণার মধ্যেই নিহিত। **এই সত্যকে অস্বীকার করা মানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে অবৈধ বলা, মুক্তিযুদ্ধকে অবৈধ বলা, বাংলাদেশের সংবিধানকে অবৈধ বলা, প্রকারান্তরে বাংলাদেশকেই অবৈধ বলা।**

এস্থলে আরেকটি কথা না বললেই নয়। জিয়াউর রহমানই যদি স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে থাকেন, একাত্তরে তার ডাকেই যদি সমগ্র বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়ে পরাক্রান্ত পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে থাকে, তা'হলে বিজয় অর্জনের পর মহান ঘোষক এবং মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক হিসেবে জিয়াউর রহমানেরই তো জাতীয় স্পটলাইটে থাকার কথা। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু যেদিন ঢাকার বুকে পা রেখেছিলেন (১০ই জানুয়ারী, ১৯৭১), সমগ্র জাতি আবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন। অথচ আরেকজন মহানায়ক কবে কোন্‌দিন বাংলাদেশে পা রাখলেন, তার কোন খোজই পেল না জনগণ! এ কি বিষম প্রহেলিকা? একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর থেকে পঁচাত্তরের পনেরই আগষ্ট পর্য্যন্ত বিপ্রতীপ জাতির পিতার কোন খোজই নেই! তাজউদ্দিন আছেন, ওসমানী আছেন, এমনকি মোস্তাকও আছেন, অথচ এতবড় একজন ঘোষকের কোন পাত্তা নেই! একথা সত্য, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণায় জাতি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিল সেদিন। কারণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিকরাও যে পাকিস্তানীদের

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তা জাতির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তারা আশ্বস্ত হয়। মেজর জিয়ার পুর্বেই প্রায় সমস্ত বাঙালি ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু প্রকাশ্য **ইথার ঘোষণা** আসে প্রথমে জিয়ার কণ্ঠ থেকেই। এদিক দিয়ে অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের চেয়ে তিনি একটু বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, এর বেশী কিছু নয়। এবং জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি নিজে কখনও তা করেননি, এরুপ হাস্যকর চিন্তা হয়তো তার মাথায়ও আসেনি।

এতগুলি ফ্যাক্টস ও প্রতক্ষ্য সাক্ষীকে বেমালুম অগ্রাহ্য করে তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা ইতিহাস বিকৃতির এক নির্লজ্জ খেলায় মেতেছে। কেন তারা একটি মীমাংসিত বিষয়কে নিয়ে অকাতরে মিথ্যার বেসাতি করে, তার কারণ পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে অকাতরে মিথ্যা বলা জাতীয়তাবাদী তথা জামাতি দর্শনের মুল বৈশিষ্ট। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্যে এমনকি জন্মদিন নিয়ে মিথ্যাচার করতেও এদের বাঁধে না। তবে স্বস্তির বিষয়- তাদের এই কাল্পনিক প্রপজিশন তাদেরই শাসনামলে (২০০১-২০০৬) হাইকোর্ট কতৃক মিথ্যা ও অবৈধ ঘোষিত হয়েছে এবং শেখ মুজিবকেই স্বাধীনতার ঘোষক বলে রায় দেয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টও হাইকোর্টের রায়কে বহাল রেখেছে। সুতরাং একথা বললে অন্যায় হবে না যে জাতীয়তাবাদীরা আদালতকতৃক ঘোষিত মিথ্যাবাদী- আইনের ভাষায় যাকে বলা হয় **'কনফার্মড লায়ার'।**

মেজবাহউদ্দিন জওহের

রিয়াদ- সৌদি আরব

তারিখ: মার্চ-২০১০

মোবাইল: ৯৬৬ ৫৫৮৯৯ ৩৯৭৬
E-mail: mezbahjowher@yahoo.com